সৌদি অতিথি এবং টরন্টোতে ভাষা দিবস

শুজা রশীদ

ফেব্রুয়ারী মাস শেষ হবার আগেই বসন্তের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে থাকলে আমাকে কেউ দোষ দিতে পারবে না। এবার সেই শীতের শুরু থেকেই যে ভাবে হিম শীতল আর্কটিক বাতাস এসে আমাদের হাঁড় মাস জমিয়ে দেবার উপক্রম করেছে তাতে উষ্ণতার আকাংখ্যা করায় দোষের কিছু থাকতে পারে না।

যাইহোক, ফেব্রুয়ারী মাসের প্রসংগ তুলেছি আবহাওয়া নিয়ে কাহিণী ফাঁদার জন্য নয়। বাংলাদেশীদের কাছে এই মাসটির কি গুরুত্ব সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। ১৯৫২ র ২১ সে ফেব্রুয়ারীর ভাষা আন্দোলনের শহীদদেরর স্মরণ করবার যে প্রথা আমরা সযত্নে পালন করে চলেছি তা এখন আর দেশের মাটিতে সীমাবদ্ধ নয়। ১৯৯৯ সালে এই দিনটিকে বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস হিসাবে ঘোষণা দিয়েছিলো জাতিসংঘ। জাগতিক অর্থে হয়তো এতে আমাদের দেশ এবং জনতার ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হয় নি কিন্তু এটা আমাদের বাংলা ভাষা-ভাষিদের জন্য নিঃসন্দেহে একটি অসম্ভব সম্মানজনক ব্যাপার।

টরন্টোতে প্রতি বছরই এই সময়টাতে নানান ধরণের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বাঙ্গালী পাড়া বলে পরিচিত ড্যানফোর্থ এভেনিউতে শহীদ মিনার বানিয়ে সেখানে শ্রদ্ধার্ঘ পর্যন্ত দেয়া হয়। প্রতিটি স্থানীয় খবরের কাগজেই সেসব খবর সুন্দর করে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। অস্বীকার করবো না GTA তে থাকলেও একটু দূরে থাকি ফলে মাঝরাতে সেখানে গিয়ে এই প্রথায় অংশগ্রহন করা কখনই হয় না। যারা নিকটে থাকেন বন্ধুদের সাথে তারা যান। সেখানে বাংলাদেশী দোকানে মুখরোচক খাবার দাবারের ব্যবস্থা থাকে। জমজমাট আড্ডা বসে। এই অনুষ্ঠানগুলির উদ্যোক্তাদেরকে সাধুবাদ জানাতেই হয়।

কয়েক বছর আগের কথা। ফেব্রুয়ারীর এই শরীর কাঁপানো শীতের মধ্যে সৌদি আরব থেকে এসে হাজির হল আমার মেডিকেল সার্জেন্ট মামাতো ভাই কবীর এবং তার পরিবার। তাদের ইমিগ্রেশন হয়ে গেছে। ল্যান্ডিং করলো। কাগজপত্র ঠিক করে আবার ফিরে যাবে আপাতত। সব গুছিয়ে টুছিয়ে পরবর্তিতে ফিরে আসার ইচ্ছা।

সৌদি আরবের রিয়াদে তাদের আবাস। স্বামী – স্ত্রী দু'জনাই ডাক্তার। দু'টি সন্তান – অল্প বয়স্ক। যে কোন নতুন দেশান্তরী দেখলেই আমি বিশেষ রকম কৌতুহলী হয়ে পড়ি। কেন এই শীতের দেশে মরতে আসা? তাও আবার খোদ উত্তাপের রাজ্য থেকে। আমি নিজে এসেছি আমেরিকা থেকে। উপায়ন্তর না দেখে। ২০০১ এর নিউইয়র্ক ট্রেড সেন্টারে টেররিস্ট আক্রমণের পর আমেরিকার সরকার কর্মী ভিসা থেকে গ্রিনকার্ড পাবার ব্যাপারটা কিঞ্চিৎ কঠিন করে দেয়। সেই সময় বহু অ্যাপ্লিকেশন রিজেক্টেড হয়। বলাই বাহুল্য আমিও সেই দলে ছিলাম। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি কানাডায় চলে এসে আমি অসম্ভব খুশী। এই দেশের প্রতি ভয়ানক মায়া হয়ে গেছে। শীত হোক আর তুষার হোক জন্মভূমির বাইরে কোন মাটিকে যদি নিজের বলে জানি এই সেই মাটি। যাইহোক, কবীরের মুখে জানলাম সৌদি আরবে ডাক্তার বিধায় জীবন সব অর্থেই পরিপূর্ণ – আর্থিক, সামাজিক, পারিবারিক। ইনকাম ট্যাক্স নেই, অন্যান্য সুবিধার সাথে প্রতি বছর সরকারী খরচে স্বদেশ ভ্রমন করবার সুযোগ যোগ দিলে আর বাকী থাকে কি! কিন্তু সমস্যাও আছে। সেখানে চাকরী ক্ষনস্থায়ী। প্রতি বছর নবায়ন করতে হয়। যে কোন মুহূর্তে বিদায় নিতে হতে পারে। সেই সম্ভাবনা খুবই কম কিন্তু অসম্ভব নয়। পার্মানেন্ট রেসিডেন্সিও দেয়া হয় না। আরোও সমস্যা আছে। ছেলেমেয়েরা ১৮ বছর হলে তাদেরকে দেশ ছাড়তে হয়। প্রধানত এই কারণেই অনেকেই সেখান থেকে পৃথিবীর নানা দেশে চলে যায় বা যাবার ব্যাবস্থা করে রাখে।

সৌদি আরবের অনেক গল্প শুনলাম তাদের কাছে। নিজে কখনই যাইনি। যেমন কুনো ব্যাঙের মত টরন্টোর মাটি কামড়ে পড়ে আছি তাতে কখনো যাওয়া হবে কিনা সন্দেহ। যাই হোক, তার মুখে শোনা দুটি ঘটনা বলি। স্থানীয়দের মানষিকতার চমৎকার প্রতিফলন।

কবীর রাতে এমার্জেন্সীতে ডিউটি করছে। সবাই এসে আগে স্লিপ নেয়। একে একে রোগীদেরকে ডাকা হয়। এক সৌদি তার সমগ্র পরিবার নিয়ে এসে হাজির। সবার জন্য একটা করে স্লিপ নিয়েছে সে। তাদের যখন ডাক পড়লো সে সবাইকে নিয়ে তার কাছে এলো।

"রোগী কে?"

"আমরা সবাই।" [কুল্লু আহাদ মান্না]

"সত্যি?"

"হ্যাঁ।"

কবীর সবার উপর একবার চোখ বুলিয়েই বুঝলো এখানে রোগী একটি দশ বছরের ছেলে। কিন্তু এদের স্বভাবই হচ্ছে দল বল নিয়ে হাজির হওয়া। অযথা চাপ বাড়ে কিন্তু ওদেরকে কে বোঝাবে। আসবার অধিকার আছে, এসে হাজির হয়। সে একে একে সবাইকে দেখলো। সবার জন্যই এটা সেটা অষুধ প্রেসক্রিপশন লিখতে হল। সব গুলো পরিবার প্রধানের হাতে ধরিয়ে দিলো সে শুধু বাচ্চা ছেলেরটা সরিয়ে রাখলো। দলবল নিয়ে ভদ্রলোক গেলো ফার্মাসীতে। কয়েক মিনিট পরেই সে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো। “ডাক্তার, আমার আসল রোগীর প্রেসক্রিপশনটাইতো নেই এখানে।”

তাকে বেশ একটা ছবক দিয়ে প্রেসক্রিপশনটা হাতে ধরিয়ে দেয়া হল। কিন্তু সন্দেহ নেই সে আবারও একই কাজই করবে।

আরেকটি ঘটনা। প্রচন্ড জোরে গাড়ী চালায় স্থানীয় সৌদি যুবকেরা। যুবতীদের ড্রাইভ করবার অনুমতি নেই। নতুন গাড়ী কিনে রাস্তায় নেমেছে কবীর। বোধহয় দ্বিতীয় দিন। প্রশস্ত রাস্তা, সৌদি তরুনদের ভয়াবহ বেগে গাড়ি চালানোর অভ্যাসে ভয় তারই বেশী। কখন কি হয়ে যায়। প্রায়ই ভয়াবহ সব এক্সিডেন্ট হয়। এক দিন আগেই তার স্ত্রী তার জন্য একটি গিফট কিনেছে। গাড়ীর ট্রাংকে লুকিয়ে রাখা। সেদিন রাতে তাকে উপহার দিয়ে তাক লাগিয়ে দেবে। কপাল খারাপ। হাইওয়েতে এক উড়নচন্ডী স্থানীয় ছেলে ঠিকই ধাম করে তাদের গাড়ীতে এসে লাগিয়ে দিল। কপাল ভালো গাড়ির অবস্থা টাইট হলেও কারো কোন শারীরিক ক্ষতি হল না। কবীর তার গাড়ীর শোকে এতই মুষড়ে পড়লো যে সে একটু পর পরই বিড়বিড় করে বলতে লাগলো,”আমার নতুন গাড়ীতে মেরে দিলে? এটা কি করে হল? আমি তো ভাবতেও পারছি না।”

যুবককে দেখে খুব একটা উদবিগ্ন মনে হল না। পুলিশ চলে এলো। কবীরের করুণ অবস্থা দেখে সে চিন্তিত কন্ঠে বলল, “ডাক্তার, তুমি ঠিক আছো তো?”

স্বামীর এমন বিধ্বস্ত অবস্থা দেখে তার স্ত্রীর কি মনে হল কে জানে, সে ট্রাংক থাকে গিফটটা বের করে পুলিশের সামনেই তার হাতে ধরিয়ে দিল। “দেখ, তোমার জন্য কিনেছিলাম”।

যেদিন ওরা টরন্টোতে এলো তার ক’দিন আগেই বিশাল তুষার ঝড় হয়ে গেছে। চারদিকে ধবধবে সাদা হয়ে আছে, রাস্তার দুপাশে টিলা সমান তুষারের স্তুপ। ভেবেছিলাম গরমের দেশ থেকে এসে বেচারীরা এই সব দেখে মুষড়ে পড়বে। উলটো হল। তার ছেলেমেয়েরা তুষারের মধ্যে লুটোপুটি খেতে যা বাকী রাখলো।

একুশে ফেব্রুয়ারী উপলক্ষে বিকালে একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলো স্থানীয় একটি বাংলাদেশী সাংস্কৃতিক সংগঠন ড্যানফোর্থের একটি সভাকক্ষে । বাচ্চাদের ছবি আঁকার প্রতিযোগীতা সহ নানান বিষয়ে আলাপ আলোচনা হবে। কবীর ডাক্তার হলেও রাজনীতিতে মনযোগ আছে। দেশপ্রেম ভয়াবহ। উচ্চশিক্ষা, চাকরী, ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যত - নানান কারণে দেশের বাইরে পা রাখলেও তার কথা শুনে মনে হয় সম্ভব হলে সে তখুনিই দেশে ফিরে গিয়ে মানুষের সেবা করতে লেগে যায়। এই অভাগার কাছে সেসব হাস্যকর মাত্র। মানব সেবা? আমার সেবা কে করে?

সেই অনুষ্ঠানে গিয়ে সময় মত হাজিরা দিলো তারা। চিত্র অঙ্কন পর্ব শেষ হতে বক্তৃতা পর্ব শুরু হল। এই বিশেষ বক্তা বোধহয় আওয়ামী লীগের সমর্থক হয়ে থাকবেন। কবীর বি.এন.পি ঘেঁষা হবার কারণে ছেলেও হয়তো কিছুটা প্রভাবিত হয়ে থাকবে। সে হঠাৎ এক পর্যায়ে উঠে দাঁড়িয়ে গেলো। সৌদিতে ইংলিশ স্কুলে প্রড়াশুনা করবার কারণে তার ইংরেজী চমৎকার। "আমি কি একটা প্রশ্ন করতে পারি?"

বক্তা তার আগ্রহ এবং উদ্দীপনায় আনন্দিতই হয়ে থাকবেন। তিনি তাকে প্রশ্ন করবার জন্য উৎসাহিত করলেন।

"বাংলাদেশের ইতিহাসে এবং স্বাধীনতায় জিয়াউর রহমানের কি ভুমিকা ছিল? আপনি তার কথা কিছুই বললেন না কেন?" ছেলেটির সোজা সাপ্টা প্রশ্ন।

সেই একই অনুষ্ঠানে অন্য একটি মেয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করল। "নিয়াজী কেন অরোরার কাছে আত্মসমর্পন করেছিল?"

জেনে ভালো লেগেছিল যে আমাদের নতুন প্রজন্ম বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের ইতিহাস নিয়ে আগ্রহী। তারা যেন নিরপেক্ষ, ঐতিহাসিক তথ্য পায় সেটা নিশ্চিত করাটা আমাদের সবার দায়িত্ব। আমাদের অভিমতকেই যেন আমাদের সন্তানেরা অন্ধের মত অনুসরণ না করে। যে বিষবাষ্প আমাদের রাজনীতিকে যুগ যুগ ধরে কালসাপের মত আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে তার ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে পরবর্তি প্রজন্মকে রক্ষা করা আমাদেরই দায়িত্ব, তা আমরা যে দেশে যে সমাজেই বসবাস করি না কেন।